বিপদ নাটের দুটি দৃশ্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

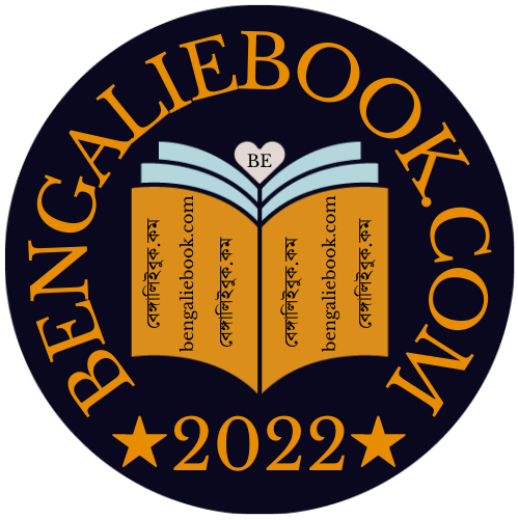

বিপদ নাট্যের দুটি দৃশ্য

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে ছোটো ছোটো এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা বর্ণনা করলে গল্পের আসরে নিতান্ত মন্দ শোনায় না। বারকয়েক আমিও এমনি ঘটনা-বিপ্লবে পড়েছিলুম, অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। আজ গুটি দুয়েক ঘটনার কথা তোমরা শশানো। কিন্তু মনে রেখো, এ দুটি সত্য-সত্যই সত্য ঘটনা!

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল বছর ষোলো আগে, দেওঘরে। সপরিবারে হাওয়া খেতে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম উইলিয়ামস টাউনে। আমাদের বাসা ছিল ওদিককার শেষ বাড়িতে। তারপরই মাঠ আর বন, তারপর নন্দন পাহাড়।

পূর্ণিমা। নন্দন পাহাড়ের ওপরে একলাটি বসে বসে দেখলুম, পশ্চিমের আকাশকে রঙে ছুপিয়ে সূর্য নিলে ছুটি। তারপর কখন যে বেলাশেষের আলোর সঙ্গে ঝরঝরে চাঁদের আলো মিলে অন্ধকার আবির্ভূত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে, কিছুই জানতে পারিনি। মিষ্টি জোছনায় চারদিক হয়ে উঠল স্বপ্নলোকের চিত্রশালার মতো। মনের ভেতর থেকে বাসায় ফেরবার জন্যে কোনও তাগিদ এল না।

কিন্তু হুকুম এল বাইরে থেকে। বোধ করি অন্ধকারই ষড়যন্ত্র করে হঠাৎ একরাশ কালো মেঘকে দিলে আকাশময় ছড়িয়ে, চন্দ্রালোক হল তাদের মধ্যে বন্দি। যদিও অন্ধকার খুব গাঢ় হল না, তবু রাত্রির রহস্যের ভেতরে চিত্রজগৎ গেল অদৃশ্য হয়ে। কবিত্বের খেয়াল ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ধরলুম বাসার পথ।

হাঁটতে হাঁটতে উইলিয়ামস টাউনে এসে পড়েছি, ওই তেমাথাটা পার হলেই বাসার পথ। তেমাথা পার হয়ে বাসায় গিয়ে পৌছতে দেড় মিনিটের বেশি লাগে না।

কিন্তু ঠিক তেমাথার পথ জুড়ে বসে আছে কে ও? যদিও অন্ধকারে তার চেহারা বোঝবার উপায় ছিল না, তবু সে যে মানুষ নয় এতে আর সন্দেহ নেই। কুকুর? উঁহু, কুকুর অত

বড়ো হয় না। কালো গোরু কি মোষ? না, তাও তো মনে হচ্ছে না। আমার কাছ থেকে হাত-পনেরো তফাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছে, অন্ধকারের চেয়ে কালো এক পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো,-এবং দপ দপ করে জ্বলছে তার দু-দুটো দুষ্ট, হিংসুক চক্ষু!

হাতে ছিল একগাছা বাবু-ছড়ি—অর্থাৎ যার দ্বারা ইঁদুরও বধ করা যায় না। তবু সেইটেকেই মাটিতে ঠুকে ঠকঠক শব্দ করে বললুম, এই! হট, হট!

ভয় পাওয়া দূরে থাক—অন্ধকার মূর্তিটা আমার দিকে আরও কয়-পা এগিয়ে এসে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে নীরবে আমাকে লক্ষ করতে লাগল। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রে তার বেপরোয়া নীরবতাকে ভয়ানক বলে মনে হল। ওটা কী জানোয়ার? ও কি আমাকে খাবার বলে মনে করেছে?

বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে তখন রীতিমতো কাঁপুনি। তবু বাইরে কোনওরকম ভয়ের ভাব দেখিয়ে পকেট থেকে বার করলুম সিগারেটের কৌটো। ধাঁ করে মাথায় কী বুদ্ধি এল, একসঙ্গে দুটো সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে খুব বেশি হুস হুস শব্দে টানতে লাগলুম! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু টানের পর টানের আর বিরাম নেই।

দুই সিগারেটের আগুন আর ধোঁয়া দেখে জানোয়ারটা কী ভাবলে জানি না, কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে তেমাথা পার হয়ে আরও খানিক দূরে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল, তারপর সেই ভয়ানক দপদপে চোখদুটো দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। বোধহয় সে কিঞ্চিৎ ভড়কে গেছে; বোধহয় সে কখনও একটা মানুষের মুখে দুটো জ্বলন্ত জিনিস দেখেনি।

আমি বুঝলুম, এই আমার সুযোগ। প্রাণটি হাতে করে দুটো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তেছাড়তে আমি অগ্রসর হলুম—তাকে যেন, গ্রাহ্যই করি না এমনি ভাব দেখিয়ে।

তেমাথার মোড়ে ফিরে বাসার পথে পড়লুম। কয়েক পা চলে মাথাটি একটু ফিরিয়ে আড়চোখে দেখলুম, সেই মস্ত বড়ো কালো জন্তুটা আবার আমার অনুসরণ করছে।

আমাকে পৃষ্টভঙ্গ দিতে দেখে সে বোধকরি বুঝতে পেরেছে, আমার মুখে একাধিক আগুন থাকলেও তার পক্ষে আমি বিপজ্জনক নই!

আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। প্রাণপণ বেগে ছুটতে শুরু করলুম। জন্তুটাও তখন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল কি না জানি না। কারণ আমি আর ফিরে তাকাইনি। বাসাবাড়ির সদর দরজার দিকে গেলুম না, কারণ দরজা হয়তো ভেতর থেকে বন্ধ আছে। এবং খুলতে দেরি হলে পিছনের জানোয়ারটা হয়তো হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়তে পারে। অতএব লম্বা দৌড়ে চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এসে পড়লুম বাসার পাঁচিলের সামনে এবং তারপর একটিমাত্র লাফে পাঁচিল টপকে একবারে ভেতরকার উঠোনে।

তোমরা আমার ছোটো ছোটো বন্ধু এবং বন্ধুদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জীবনে আর কখনও আমি সেদিনকার মতো ভয়ানক ভয় পাইনি।

পরদিন সকালে খবর পেলুম, গতকল্য রাত্রে উইলিয়ামস টাউনে একটা ভাল্লুক নৈশবায়ু সেবন করতে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর আগে। আমার বয়স তখন অল্প। জীবনটা কবিত্বের রঙিন কল্পনায় সুমধুর।

গোমো জংশন খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনে বাবা আমায় পাঠালেন গোমোয় একখানা বাড়ি ভাড়া করবার জন্যে।

বসতি হিসাবে আজকাল গোমোর কতটা উন্নতি হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন গোমোয় হাওয়া-ভক্ষকদের উপযোগী বাড়ি পাওয়া যেত না। অনেক খুঁজে রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাসা পাওয়া গেল, তার নাম ডি কস্টা সাহেবের বাংলো।

আমার চোখে মনে হল তাকে আদর্শ বাংলো। মানুষের বেড়াতে যাওয়া উচিত এমন কোনও জায়গায়, যেখানে নেই ঘিঞ্জি শহরের ধোঁয়া, ধুলো আর হট্টগোলের উপদ্রব। এক শহর থেকে আর এক শহরে গেলে বায়ু পরিবর্তন হয় না।

ডি কস্টা সাহেব কবিতা লিখতেন কি না খবর পাইনি, কিন্তু মনে মনে তিনি কবি ছিলেন নিশ্চয়। কারণ বাংলোখানি তৈরি করেছিলেন শ্রেণিবদ্ধ শৈলমালার কোলে, লোকালয় থেকে দূরে! ওপরে পাহাড়ের বুকে আমলকী গাছের সবুজ ভিড়, নীচে চারদিকে শালবনের পর শালবন আর ছছাটো-বড়ো ঝোপঝাপ। মানুষের চিৎকার নেই, আছে শুধু মর্মর তান আর পাখিদের গান। দূরে দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশের অনেকখানি জু9ে, ধবধবে সাদা জৈন মন্দিরের চূড়ো পরে চিরস্থির নিরেট মেঘের মতো পরেশনাথ পাহাড়। প্রকৃতির রূপে মন নেচে উঠল। বাংলোখানি ভাড়া করে ফেললুম।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আমরা সপরিবারে গোমোয় গিয়ে হাজির হলুম।

কিন্তু বাংলোর অবস্থা দেখেই আমার বাবার চক্ষুস্থির! রেগে আমাকে বললেন, হতভাগা ছেলে, আমাদের তুই বনবাসে এনেছিস? সব তাতেই তোর কবিত্ব? এখানে শেষটা কি বাঘভালুকের পেটে যাব? এ যে গহন বন, কী সর্বনাশ!

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলোর হাতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রাখাল ছেলে। বাবার কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যা বাবুজি, এ কুঠি কেউ ভাড়া নেয় না। শীতকালে ওই বারান্দায় বাঘ এসে শুয়ে থাকে।

তখন শীতকাল। বাবা অত্যন্ত চমকে উঠে বললেন, আঁঃ, বলিস কী রে? না, মজালে দেখছি।

মা কিন্তু বাংলোর পিছনের পথের দিকে খুশি-চোখে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, আহা, কী চমৎকার! ওগো, দ্যাখোদ্যাখো, ওখানে কেমন বনের হরিণরা চরে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন তপোবন!

বাবা আরও রেগে গিয়ে বললেন, রাখো তোমার তপোবন! খবরদার, কেউ আর মোটমাট খুলো না, আজ রাতটা কোনওগতিকে এখানে কাটিয়ে কালকেই কলকাতায় পালাতে হবে।

মা বেঁকে বসে বললেন, কলকাতায় পালাতে হয় তুমি একলা পালিয়ো। আমরা এখানেই থাকব।

অনেক কথা-কাটাকাটির পর মায়ের জিদ দেখে বাবা শেষটা হার মানতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু বাবা যে মিথ্যে ভয় পেয়েছিলেন তা নয়। তোমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দিদি, সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? তার কাছেও পরে আমি এই বাংলোর উজ্জ্বল বর্ণনা করেছিলুম। বাংলোখানি বিক্রয় করা হবে শুনে তিনি কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পরে স্বচক্ষে বাংলোর অবস্থান দেখে তাঁর সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে যায় এবং আমাকে চিঠিতে লেখেন, হেমেন্দ্র, বাঘ-ভালুক কি ডাকাতের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণ গেলেই কি তুমি খুশি হও? এ কী ভীষণ স্থান, এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে?

সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ, আমি কবিত্বে অন্ধ হয়ে কীরকম জায়গা নির্বাচন করেছিলুম! কিন্তু এটাও শুনে রাখো, দু-মাস সেখানে ছিলুম, বাংলোর মধ্যে কোনওরকম বিপদে পড়িনি।

কিন্তু বিপদে পড়েছিলুম বাংলোর বাইরে প্রাকটিক্যাল জোক করতে গিয়ে। সেই কথাই এবারে বলছি।

খাঁচায় বন্ধ পাখি ওড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কলকাতার মেয়েরা দিনরাত ইটের পিঞ্জরে বন্দি হয়ে থেকেও পদচালনার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেন না, তাঁদের শহরের বাইরে নিয়ে গেলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে মা রোজ বিকালেই মহা-উৎসাহে বেড়াতে যান এবং বনজঙ্গল পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ভ্রমণ করে তবে বাংলোয় ফিরে আসেন।

বাবা নিয়মিত-রূপে প্রতিবাদ করেন। আমিও মানা করি। সত্যই এটা বিপজ্জনক। কিন্তু মেয়েরা কেউ আমাদের আপত্তি আমলেই আনেন না।

শেষটা মনে দুষ্টবুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। আমার একখানি ব্যাঘ্রচর্ম ছিল। আমি সেখানিকে আসনরূপে ব্যবহার করবার জন্যে গোমোতেও নিয়ে গিয়েছিলুম।

একদিন বিকালে বাড়ির মেয়েরা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছেন, সেই বাঘ-ছালখানি গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে আমিও বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধার থেকে বাংলোয় ফেরবার পথ আছে একটিমাত্র,মেয়েদের সেই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।

স্থির করলুম, এই বাঘ-ছালে নিজের সর্বাঙ্গ মুড়ে, পথের ধারের কোনও ঝোপের ভেতর থেকে মেয়েদের ভয় দেখাতে হবে। তা হলেই, অর্থাৎ একবার ভয় পেলেই তারা কেউ আর বনজঙ্গলে বেড়াতে আসবেন না।

অবশ্য এই প্র্যাকটিকাল জোক-এর মূলে ছিল সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল দাঁড়াল হিতে বিপরীত।

পথের ধারে, পাহাড়ের পায়ের তলায় যুতসই একটি ঝোপ খুঁজে পেলুম। আকাশে তখন সূর্য নেই, সন্ধ্যা হয় হয়। বাঘের ছালে সর্বাঙ্গ ঢেকে সেই ঝোপের মধ্যে আধখানা দেহ ঢুকিয়ে জমি নিয়ে বাগিয়ে বসলুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই দূর থেকে শুনতে পেলুম মেয়েদের কৌতুক-হাসিময় কণ্ঠ। বুঝলুম, সময় হয়েছে।

বাঘ-ছালের মুখের দিকটা নিজের মুখের ওপরে চাপা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিকে চোখ পড়ে গেল অকারণেই। যা দেখলুম দুঃস্বপ্নেও কখনও দেখিনি।

হাত ত্রিশেক ওপরে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্থিরভাবে বসে, একটা আসল মস্তবড়ো বাঘ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার পানে!

প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল। কারণ বাঘের দেহটা স্থির বটে, কিন্তু তার ল্যাজটা লটপট করে আছড়ে পড়ছে। পিছনের ঝোপ দুলিয়ে বারংবার। ওরকম ল্যাজ আছড়ানোর অর্থ বোধহয়, সে উত্তেজিত হয়েছে দস্তুরমতো!

এ দৃশ্য দেখবার পরেও কারুর প্রাণে আর প্র্যাকটিক্যাল জোক-এর প্রবৃত্তি থাকে না, থাকে কি? তাড়াতাড়ি বাঘ ছালখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনে লম্বা দিতে যাচ্ছি,

এমন সময়ে ওপরের বাঘটা অস্পষ্ট একটা গর্জন করে হঠাৎ লাফ মেরে তার পিছনের ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল! অদৃশ্য হওয়ার সময়ে তার সেই চাপা গর্জনের অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল, ওরে ধূর্ত মানুষের বাচ্চা! তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস, আমি ততটা বোকা নই?

বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু সেখানে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াইনি। পাগলের মতন দিলুম বাংলোর দিকে সুদীর্ঘ এক দৌড়,একবারও এ কথা মনে উঠল না যে, বাঘটা যদি আবার তদারক করতে আসে তা হলে বাড়ির মেয়েদের অবস্থা কী হবে!

কিন্তু বাংলোয় পৌছে নিজের কাপুরুষতার কথা মনে করবার সময় পেলুম। বাসায় বাবা তখন ছিলেন না। লাঠিসোটা, চাকর-বাকরদের নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এলুম তখন দেখি, মেয়েরা মনের সুখে হাসতে হাসতে ও গল্প করতে করতে ফিরে আসছেন!

ভাবলুম, বাঘটা হঠাৎ অমন করে পালাল কেন? বোধহয় একে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ দেখেই সে চমকে গিয়েছিল, তার ওপরে মরা বাঘের চামড়াখানা ছুড়ে ফেলে দিতে দেখে জ্যান্ত

বাঘটা ভেবে নিয়েছিল যে, তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে দুষ্ট মানুষের এ কোনও নতুন ফাঁদ বা ফন্দি! এ ছাড়া তার আচরণের আর কোনোই মানে হয় না।

আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে আরও কয়েকটি বিচিত্র ঘটনার রেকর্ড আছে। কিন্তু এক দিনেই আমার পুঁজি খালি করতে চাই না। তোমাদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আরও গল্প বলতে পারি।